অর্থনীতির মুদ্রাদোষ

মৈত্রীশ ঘটক

১. সকল লোকের মাঝে বসে, আমার নিজের মুদ্রাদোষে, আমি একা হতেছি আলাদা?

তেল মাখতে গেলে অধিকাংশ সময় কড়ি ফেললেই কাজ চলে, ঘানি-অধিগ্রহনের ঝামেলায় জড়ানোর দরকার হয়না। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে দেশে এবং বিদেশে যে বিতর্ক চলছে, অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে তার মূলে আছে এই হেঁয়ালি। জমি হলো শ্রম বা পুঁজি বা খনিজ পদার্থর মতো আর পাঁচটা অর্থনৈতিক সম্পদের একটা, যেখানে তার উত্পাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি সেখানেই তার বাজার দরও সবচেয়ে বেশি, তাই বাজারী অর্থনীতিতে সেখানেই তার নিয়োগ হবার কথা। তার জন্যে সরকারের বা অন্য কারোর গা জোয়ারি করার দরকার হবার কথা নয়। জমির যা বাজার দর তাতে যদি কৃষকরা শিল্পপতিদের জমি বেচতে না রাজি হন, তাহলে এই বর্ধিত চাহিদার জন্যে জমির দাম বাড়তে থাকবে। শিল্পে যদি জমির উত্পাদনশীলতা কৃষির থেকে বেশি হয় তাহলে একটা সময়ে জমির দাম বেড়ে এমন জায়গায় পৌঁছবে যে কিছু কৃষক সেই বর্ধিত দামে তাঁদের জমি বিক্রী করে দিতে রাজী হবেন আবার লাভের অঙ্ক খানিক কমলেও সেই দামে কিছু শিল্পপতি ওই জমি কিনতে রাজি হবেন। আর তা যদি না হয়, তাহলে জমির এমন কোনো বাজার দর নেই যাতে কৃষকও জমি বেচতে রাজি হবেন আর শিল্পপতিও জমি কিনতে রাজি হবেন। অর্থনীতির পাঠ্য পুস্তকে চাহিদা আর যোগানের কথা দিয়ে যে প্রথমপাঠ শুরু হয়, এ সেই তত্ত্বেরই অতি সরল একটা প্রয়োগ।

আপাতসহজ এই যুক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে অর্থনীতির অনেকগুলো স্বতঃসিদ্ধ। আমি এই প্রবন্ধে তার কয়েকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমটি হলো, এমন কোনো মুদ্রা (currency) আছে যার মাধ্যমে এই বিনিময় সম্ভবপর। আমি যদি পাড়ার দোকানে চা খেয়ে জাপানি ইয়েন দিয়ে দাম দেবার চেষ্টা করি - কিম্বা ফুচকা খেয়ে ফস করে বার করি এটিএম কার্ড - তাহলে গণ্ডগোলের সমূহ সম্ভাবনা। কোনো ব্যাঙ্কে বা মুদ্রা-বিনিময় কেন্দ্র থেকে ঘুরে আসলে (হয়ত কিছু দক্ষিণা দিয়ে) এই বিনিময়গুলি সম্ভব। কিন্তু সমস্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বজনীন কোনো মুদ্রা আছে ধরে নেওয়াটা খুব বড় ভুল হবে অথচ অর্থনীতির জগত আক্ষরিক এবং আলংকারিকভাবে এই মুদ্রাদোষে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয়টি হলো, সম্পদের বন্টনে (allocation) উত্পাদনশীলতা সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়াটা কাঙ্খিত। উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু আর সমস্ত দিক ভুলে শুধু তার ওপর নজর দিলে তা সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য না হতে পারে, যার ফল হতে পারে মারাত্মক। এ হলো আরেক মুদ্রাদোষ - যার পোশাকি নাম উপযোগিতাবাদ (utilitarianism) - এবং যার শিকড় অর্থনীতির জগতের খুব গভীরে প্রথিত। তৃতীয়টি হলো, ক্রেতা এবং বিক্রেতার এই বিনিময়ের তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ওপর প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব পড়বেনা তাই ক্রেতা এবং বিক্রেতা এই দুপক্ষের সম্মতি থাকলেই এই বিনিময়টি হতে পারে। প্রথম দুটি বিষয়ের তুলনায় এই বিষয়টি - যা বাহ্যিক প্রভাব (externality) বলে অভিহিত - সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা অনেকটাই সচেতন। এর প্রচলিত উদাহরণ হলো পরিবেশ দূষণ - আমি গাড়ি কিনলাম গাড়ির দোকান থেকে, পেট্রল কিনলাম পেট্রল পাম্প থেকে, পিকনিক করতে গেলাম গড়ের মাঠে কিন্তু বিষাক্ত ধোঁয়ায় কাহিল হলো পথচারীরা, এইরকম ক্ষেত্রে লেনদেন অবাধ হতে পারেনা, নিয়ন্ত্রণ অতি আবশ্যক।

এখন পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুরে জমি নিয়ে যে ভাবে সরকারি হস্তক্ষেপ হয়েছে তার গোড়ায় যে গলদ ছিল তা নিয়ে খুব দ্বিমত হবার জায়গা নেই । উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে শিল্পের জন্যে কৃষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জমি কেড়ে নেওয়া অর্থনৈতিক মূল্যায়নের তিন প্রধান মাপকাঠি - অর্থনৈতিক দক্ষতা (efficiency), ব্যক্তি স্বাধীনতা (liberty) অথবা সাম্য (equity) - কোনদিক থেকেই সমর্থন করা যায়না। প্রথমটি দাবী করে সম্পদের যেখানে উত্পাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি সেখানেই তার নিয়োগ হওয়া কাম্য। তাই এমন যদি হয় যে কোনো জমির উত্পাদনশীলতা কৃষির থেকে শিল্পেই বেশি, তাহলে নিশ্চই এমন কোনো ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বার করা সম্ভব যাতে কৃষক সেটা ছেড়ে দিতে স্বেচ্ছায় রাজি হবেন । দ্বিতীয়টি দাবী করে যে কোনো লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতা দুজনকেই স্বেচ্ছায় রাজি হতে হবে, কোনরকম জোর জবরদস্তি করা যাবেনা। তৃতীয়টি দাবী করে যেসমস্ত লেনদেনে অসাম্য বাড়ে, উত্পাদনশীলতা বাড়ুক আর না বাড়ুক, সেগুলিতে সামাজিক কল্যাণ হ্রাস পায় । [১] গরিব কৃষকের জমি জোর করে কেড়ে নিয়ে ধনী শিল্পপতি কে দিলে স্বাভাবিকভাবেই অসাম্য বাড়ে। বামপন্থীরা সাধারনত সাম্যের ওপর জোর দেন, উদারপন্থীরা দেন অর্থনৈতিক দক্ষতার ওপর, এবং দুপক্ষই দাবী করেন যে তাঁরা ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক। খুব অল্প বিষয় আছে যাতে তাঁরা একমত হতে পারেন, এটা তার একটা বিরল উদাহরণ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সব ভুল এড়িয়ে চললেও কি সরকারের আদৌ কোনো ভূমিকা থাকতে পারে, না কি পুরোটাই বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত ? আর যদি থেকে থাকে, কি তার সম্ভাব্য রূপরেখা ? এই মুহূর্তে সংসদে ব্রিটিশ আমলের জমি অধিগ্রহন আইনের সংশোধন নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, স্বাভাবিকভাবেই তাতেও প্রধান বিষয় এটাই।

জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিতর্কে এতজন এত কিছু বলেছেন, রাজনীতি-অর্থনীতি-আইন সব মিলেমিশে এমন একটা বিতিকিচ্ছিরি ঘন্ট পাকিয়ে আছে, তাতে আর নতুন করে ফোড়ন দেবার ইচ্ছে ছিলনা।[২] খানিকটা স্বভাবদোষ, খানিক গবেষক হিসেবে পেশার তাগিদ, এবং খানিক নেপথ্যে সব ব্যাপারে খালি ওই সরকার না বাজার নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল না মোহন বাগান মার্কা একঘেয়ে বিতর্ক - এসব কারণেই বোধহয় লিখতে বসামাত্র নাছোড়বান্দার মতো এই বিষয়টি এসে কলমে চেপে বসলো। তবে বিষয়টির সমস্ত দিক দিয়ে সম্যক বিচার করা এই প্রবন্ধের (এবং প্রাবন্ধিকের ক্ষমতার) ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভবপর হবেনা। একে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক তত্ত্বের এবং নীতির জগতে কিছু যে মুদ্রাদোষ নিহিত আছে যার সম্পর্কে আমরা সব সময়ে সচেতন থাকিনা এবং যার জন্যে আমাদের চিন্তা এবং বাস্তবের মধ্যে বড় ফাঁক থেকে যায়, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। যাই হোক, গৌরচন্দ্রিকা অনেক হলো, এবার কাজের কথায় ফিরি।

২. বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি

বাজারের যুক্তি আর অর্থনৈতিক দক্ষতার মধ্যে যে সম্পর্ক তা হলো উপযোগিতাবাদের প্রধান উপজীব্য। এই প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন তাঁর সাম্প্রতিক বইয়ে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে। [৩] তিন জন বাচ্চা একটা বাঁশি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। তাদের নাম ধরা যাক অমল (A), বিমল (B), এবং চঞ্চল (C) । অমল খুব ভালো

বাঁশি বাজায়, বিমল বাকি দুজনের তুলনায় খুব গরিব - তার কোনো খেলনাই নেই, আর চঞ্চল অনেক খেটেখুটে বাঁশিটা তৈরী করেছে। উপযোগিতাবাদের দিক থেকে দেখলে অমলের কাছে বাঁশিটার যে মূল্য তা যদি চঞ্চলের কাছে তার যে মূল্য তার থেকে বেশি হয় তাহলে অমলেরই বাঁশিটা প্রাপ্য। একজন সাম্যপন্থী (egalitarian) বলবেন বাঁশিটা বিমলের প্রাপ্য কারণ সে সব চেয়ে গরিব। একজন উদারপন্থী (libertarian) বলবেন বাঁশিটা চঞ্চল তৈরি করেছে তাই ও স্বেচ্ছায় না দিলে বাঁশিটা ওর থেকে কেড়ে নেবার অধিকার কারোর নেই। [৪]

সামাজিক চয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায্য বন্টনের ধরণ নিয়ে যে নানা বিকল্প মত থাকতে পারে তা বোঝাতে অধ্যাপক সেন এই উদাহরণটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রসঙ্গের কথা মাথায় রেখে ব্যাপারটাকে বিমূর্ত সামাজিক চয়নের সমস্যা হিসেবে না দেখে ভেবে দেখা যাক বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই দন্দ্বগুলির কিভাবে সমাধান হবে।

বাজারের যুক্তি ব্যবহার করলে অমলের কাছে বাঁশিটার যে মূল্য তা যদি চঞ্চলের কাছে তার যে মূল্য (যা তার ব্যবহার-মূল্য এবং সেটা তৈরি করার খাটনি-র যে মূল্য এই দুইয়ের যোগফল) তার থেকে বেশি হয়, তাহলে অমল এমন দাম দিতে পারবে যাতে চঞ্চল স্বেচ্ছায় তাকে বাঁশি টা দিয়ে দেবে। আর তা যদি না হয়, তাহলে চঞ্চলের কাছেই বাঁশি টা থেকে যাবে, কারণ সে হলো বাঁশিটার মালিক। অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হবে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠিক সেই জমির উদাহরণটির মতো। হায়েক এবং ফ্রিডম্যানের মতো অর্থনৈতিকের কাছে মুক্ত বাজার এই কারণে আদর্শ ব্যবস্থা। এখন চঞ্চলের থেকে কেড়ে নিয়ে বাঁশিটা অমল কে দিলেও একই ফল হবে - যেমন, যদি আমলাতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় এবং অমলের মামা কোনো হোমরাচোমরা লোক হন, তাহলে যা হবে - কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার দিক থেকে তা গ্রহনীয় হবেনা । শুধু তাইনা, এই অভিজ্ঞতার পর, চঞ্চল আর জীবনে কখনো বাঁশি তৈরি করবেনা, বা করলেও করবে অতি সঙ্গোপনে। তাই একটু দীর্ঘমেয়াদী ভাবে চিন্তা করলে, অর্থনৈতিক দক্ষতাও খর্ব হবে। আবার সাম্যবাদী ব্যবস্থায় চঞ্চলের থেকে নিয়ে বাঁশিটা বিমলকে দেওয়া হবে যা অর্থনৈতিক দক্ষতা (স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী দুইই) এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী কিন্তু সাম্যের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য।

এখন সাম্য এবং অর্থনৈতিক দক্ষতার মধ্যে এই দ্বন্দটি সুপরিচিত এবং এদের মধ্যে যে একটা মাঝামাঝি রফা করা দরকার তা নিয়ে অন্তত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই। এই উদাহরণটিতে বন্টনের সমস্যাটা খুব চরম ভাবে পেশ করা হয়েছে - বাঁশিটা একজনকেই দেওয়া যাবে। অমল যদি বাঁশিটা কিনে নেয় চঞ্চলের কাছ থেকে, এবং সেই দামের একটা অংশ কর হিসেবে কেটে নিয়ে, তা দিয়ে বিমলকে অন্য কোনো খেলনা কিনে দেওয়া হয়, তা হবে এক ধরণের সমাধান। অন্যথা, তিনজনেই যদি বাঁশিটা মিলেমিশে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে তা হবে আরেক ধরণের সমাধান। দুক্ষেত্রেই কিন্তু হয় বহিরাগত কাউকে লাগবে এই বিনিময় গুলো সুষ্ঠু ভাবে হচ্ছে কিনা নজর রাখার জন্যে এবং দরকার হলে কাউকে শাসন করার জন্যে, নয়তো এই তিনজনকে বুঝতে হবে যে তাদের কেউ একজন নিয়ম ভাঙলে বাকিরা তার সাথে আর ভবিষ্যতে খেলা করবেনা। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নানা রীতি নীতি (formal and informal institutions) এবং সামাজিক দস্তুর (social norms) ছাড়া সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির জগত অচল, এই সরল উদাহরণটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই সহজ উদাহরণটির মধ্যে দিয়ে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ বন্টনের অনেকগুলো সীমাবদ্ধতাই দেখানো যায় । যেমন, এমন হতেই পারে যে এই তিন জনের মধ্যে আসলে বিমলেরই বাঁশি বাজানোর প্রতিভা সবচেয়ে বেশি, কিন্তু দারিদ্রের কারণে সে ঠিকমত তালিম পায়নি বলে সে অমলের মতো দক্ষ হতে পারেনি । এই ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমতা এবং অর্থনৈতিক দক্ষতার মধ্যে দ্বন্দটি যতটা তীব্র বলে মুক্ত-বাজারপন্থীরা দাবী করেন, ততটা নয় । কিন্তু আমি সূচনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলির ওপরেই মনোযোগ দিতে চাই।

প্রথম সমস্যাটি হলো এমন কোনো সর্বজনগ্রাহ্য মুদ্রার উপস্থিতি যার মাধ্যমে বিনিময় সম্ভবপর। এই উদাহরণটির ক্ষেত্রে অমল যদি চঞ্চলকে এমন কিছু দিতে পারে, যা তার কাছে ওই বাঁশিটির থেকে অধিক মূল্যবান, তাহলে তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাবিনিময় হতে পারে । ভাবা যাক সেটা কি হতে পারে । সবচেয়ে সোজা উদাহরণ হলো টাকা-পয়সা । অর্থনীতিবিদরা অনেক সময়েই বলে থাকেন যে সবকিছুরই একটা মূল্য আছে, বা, টাকা দিয়ে সব কেনা যায় । তা নিশ্চয়ই সবার ক্ষেত্রে এবং সব সময় সত্যি নয়, তা না হলে এই পৃথিবীটা খুব বাসযোগ্য হতনা। [৫] যাই হোক, মুদ্রা হিসেবে টাকার আকর্ষণ হলো, যে কোনো জিনিসের সাথে তার বিনিময় করা সোজা, পণ্যবিনিময় ব্যবস্থার (barter) সীমাবদ্ধতা তো সবাই জানে। কিন্তু হতে পারে চঞ্চলের কাছে টাকার মূল্য নেই, সে ছেলেমানুষ তাই মা-বাবা টাকাকড়িতে হাত দিতে দেননা বা টাকা পকেটে দেখলে চাঁটা মেরে তার দাদা সেটা কেড়ে নেবে। অথবা, তার বাড়ির কাছে খেলনার কোনো ভালো দোকান নেই। এই সব ক্ষেত্রে টাকা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবের খুব কার্যকর নয় । টাকার পরিবর্তে কোনো জিনিস দেবার প্রস্তাব করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা এমন কিছু হতে হবে, যা চঞ্চল ব্যবহার করতে পারে, এবং সেটা তার কাছে মূল্যবাণ।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো, যদিও বা অমল এবং চঞ্চল দুজনে মিলে এমন কোনো লেনদেনের ব্যবস্থা বার করে ফেলে যাতে তারা দুজনেই খুশি, বিমলের ভাগ্যে তো জুটলনা কিছুই। এ নিয়ে তার বিক্ষোভ হতে পারে, তাই সে বাকি দুজনের সাথে এমন ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়ে দিতে পারে যাতে বাঁশিটাই গেল ভেঙ্গে। অথবা সে একা বা তার মতো পাড়ার আরো যত গরিব শিশু আছে তাদের সাথে মিলে অমল এবং চঞ্চলের সাথে এমন অসহযোগ করতে পারে (যেমন, তাদের খেলতে না নেওয়া, যা অন্তত বাচ্চাদের কাছে খুবই নির্মম শাস্তি) যাতে আখেরে তাদের সার্বিক কল্যাণ হ্রাস হতে পারে। মোদ্দা কথা হলো, যে কোনো বন্টন ব্যবস্থা যদি অন্যায্য বলে পরিগণিত হয়, তাহলে তাতে আপাতদৃষ্টিতে উত্পাদনশীলতা বাড়লেও সার্বিক ভাবে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি হয়না । এখন যেকোনো বন্টন ব্যবস্থাতেই - সে বাজারই হোক আর তথাকথিত পরিকল্পিত অর্থনীতিই হোক - পরিণামে কিছু অসাম্য থেকে যাওয়া অনিবার্য্য । কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটি যদি ন্যায্য বলে সর্বজনগৃহীত হয় এবং অসাম্যের মাত্রা যদি চরম না হয়, তা হলে তা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থনীতিবিদরা অনেক সময়েই উপযোগিতাবাদের মুদ্রাদোষের কারণে এই সহজ কথাটি খেয়াল রাখেননা : অমল এবং চঞ্চল স্বেচ্ছায় বিনিময় করেছে, আর বিমলের আগের থেকে অবস্থা খারাপ হয়নি তাই এই বন্টন নিয়ে আপত্তি করার মত কিছু নেই বলেই তাঁরা মনে করবেন। আবার এ কথাও সত্যি যে উল্টোদিকের যে যুক্তি মাঝে মাঝে শোনা যায় - যে সবাই উপকৃত না হলে বা যেকোনো প্রকল্পের সমস্ত উদ্বৃত্ত সবার মধ্যে সমান ভাবে ভাগ না হলে কিছুই করা যাবেনা - সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আর্থিক বিকাশহীনতা এবং দারিদ্রের সমবন্টন।

তৃতীয় সমস্যাটা হলো, ধরে নেওয়া হচ্ছে চঞ্চল সম্পূর্ণ একাএকা বাঁশিটা তৈরি করেছে, তাই সেটার একচ্ছত্র মালিকানা তার, আর তাই তাকে রাজি করাতে পারলেই বাঁশিটার মালিকানা অন্য কারোর হাতে যেতে পারে । কিন্তু খুব কম জিনিসেরই এইরকম একচ্ছত্র মালিকানা থাকে । এই বাঁশিটা তৈরি করতে যা যা সরঞ্জাম লেগেছে তা যদি বাজার থেকে কেনা হয়ে থাকে তাহলে সেই লেনদেনের মধ্যে দিয়েই তার স্বত্তাধিকার বিনিময় হয়ে গেছে । এখন বাঁশের দোকানের মালিক যদি এসে চঞ্চল কে বলে তুমি যে বাঁশি বিক্রি করলে তার দামের ভাগ আমারও চাই তাহলে মুশকিল, যদিনা এই মর্মে আগে থেকেই তাদের কোনো বোঝাপড়া হয়ে থাকে (যেমন হয়ে থাকে ভাগচাষের ক্ষেত্রে) । কিন্তু আমরা যদি বাঁশির উদাহরণ ছেড়ে জমি বা যন্ত্রপাতি বা অন্য কোনো উত্পাদনের উপকরণের উদাহরণ নিয়ে দেখি, তাহলে ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে ভাবা যাবে । ধরা যাক ওই জমিটা যে ফসল চাষের জন্যে ব্যবহার করা হয়, বা যন্ত্রটি যে বিশেষ জিনিস তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়, তার জন্যে জমি বা যন্ত্রের মালিককে বাদ দিলে অন্য যারা উত্পাদনের সাথে জড়িত (যেমন ভাগচাষী, বা কারিগর) তাদের কিছু সময় বা অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন । এরকম প্রায় সব কাজেই করতে হয়, কিন্ত ধরা যাক এই বিনিয়োগগুলি এমন যে সেগুলি ওই বিশেষ জমির জন্যে বা ওই বিশেষ যন্ত্রের জন্যে বিশেষভাবে উপযুক্ত, অন্য কোনো জমিতে বা যন্ত্রে ব্যবহার করলে তাদের উত্পাদনশীলতা কমে যাবে বা আদৌ কাজে লাগবেনা । অর্থনীতির ভাষায় একে সম্পর্ক-ভিত্তিক বিনিয়োগ (relationship -specific investment) বলে । এর উল্টো হলো এমন বিনিয়োগ যা খুব সহজেই এক কাজ থেকে অন্য কাজে স্থানান্তরিত করা যায় । একে বলে সাধারণ বিনিয়োগ (general investment) । [৬] প্রথম ধরণের বিনিয়োগটি যদি আপেক্ষিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে যে সম্পদের (asset) সাথে মিলে কাজ করলে তার উত্পাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি হয় সেই সম্পদ হস্তান্তরিত হয়ে গেলে এবং অন্য কোনো ব্যবহারে নিয়োজিত হলে বিনিয়োগকারীর ক্ষতি হবে । শুধু তাইনা, এই রকম হতে পারে আশঙ্কা থাকলে সে এই ধরণের বিনিয়োগ কম করবে বা আদৌ করবেনা, যা হবে অর্থনৈতিক দক্ষতার পরিপন্থী । এই সব ক্ষেত্রে যদি না এই সম্ভাবনার কথা সম্পদটির মালিক এবং শ্রমজীবি আগে থেকেই ভেবে রেখে তাঁদের চুক্তির মধ্যে সেই বাবদ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে রেখে থাকেন, তাহলে সমস্যা নেই । তা না হলে এই সম্পদটির কেনা-বেচার অধিকারের (exchange rights) ক্ষেত্রে যদি তার আইনি মালিকের অধিকারই একমাত্র সার্বভৌম বলে স্বীকৃত হয়, এবং অন্য যাদের সম্পদটির ব্যবহারের অধিকার (use rights) ছিল তাদের কোনো ক্ষতিপূরণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তা হলে অর্থনৈতিক দক্ষতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, এবং সাম্য তিন দিক থেকেই সমস্যা । অবশ্য যদি বিনিয়োগটি সম্পর্ক-ভিত্তিক হয়, তবেই এই যুক্তিটি খাটে, তা না হলে উত্পাদনের প্রক্রিয়ায় যারাই কোনো না কোনো ভাবে জড়িত তারা সবাই যদি ভাগ চাইতে বসে তাহলে সেই অর্থনৈতিক সম্পদ চিরকালের মতো তার বর্তমান ব্যবহারেই আবদ্ধ থাকবে, যা অর্থনৈতিক প্রগতির প্রতিপন্থী । [৭]

৩. সিঙ্গুর: বিধি বাম

ফিরে আসি সিঙ্গুরে । গত বছর অগাস্ট মাসের এক মেঘলা সকালে আমার প্রথম সিঙ্গুর-যাত্রা । ন্যানো-পর্ব শেষ হয়ে গেছে কিছুদিন আগে । পরিত্যক্ত কারখানার পাশে বর্ষার জলে ভেজা দিগন্তবিস্তৃত সবুজ চাষের জমি । আমরা কয়েকজন অর্থনীতিবিদ মিলে গিয়েছিলাম ওখানকার কৃষকদের সাথে কথা বলে বুঝতে চেষ্টা করতে যে কেন তাঁরা শিল্পের জন্যে জমি দিতে অনিচ্ছুক এবং কি ধরণের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে । আগেই বলেছি, বাস্তবে

যেভাবে জমি তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, এবং যে রকম ক্ষতিপূরণ তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, তা যে ভুল ছিল তা নিয়ে দ্বিমত হবার জায়গা নেই। আমাদের প্রশ্ন ছিল ভবিষ্যতে আবার এই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কি শিখতে পারি তা যাঁরা এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত তাঁদের কথা শুনে বুঝতে চেষ্টা করা। আমরা যাঁদের সাথে কথা বলেছিলাম তাঁদের মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি, এবং সম্পন্ন কৃষক, ভাগচাষী (নথিভুক্ত এবং অ-নথিভুক্ত), আর কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমজীবি সবাই ছিলেন। [৮]

এই কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে যে প্রথম যে বিষয়টা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো, তুলনামূলক ভাবে দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র কৃষকেরা জমি বিক্রী করতে অনিচ্ছুক, আর সম্পন্ন কৃষকেরা ভালো দাম পেলে জমি বিক্রী কর্তা রাজি কারণ চাষের কাজে আগের মতো লাভ নেই। প্রথমোক্ত গোষ্ঠির কৃষকদের আমরা জিগ্গেস করলাম যে বাজার দরের থেকে অনেক বেশি দর পেলেও তারা জমি বিক্রী করতে রাজী কিনা, তাতে তাঁরা বললেন না। অর্থনীতির মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত নই, তাই খটকা লাগলো। তাঁদের প্রশ্ন করলাম নিশ্চই এমন কোনো দাম আছে যাতে আপনি জমিটা বিক্রী করে দেবেন, আর তা যদি না হয় তাহলে কেন ? উত্তরে তাঁরা বেশ কয়েকটি কারণ বললেন, যা এর আগের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। প্রথমত, তাঁরা কৃষি কাজেই দক্ষ, হাতে অনেক টাকা পেলে তা কৃষির বাইরে বিনিয়োগ করার মতো দক্ষতা, মানসিকতা, এবং যোগাযোগ তাঁদের নেই। দ্বিতীয়ত, চাষের থেকে অন্য কোথাও (যেমন ব্যাঙ্কে) বিনিয়োগে লাভের হার বেশি হলেও, মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হারের ওঠাপড়া নিয়ে তাঁরা চিন্তিত। তৃতীয়ত, অর্থনীতির হাল যাই হোকনা কেন চাষের জমি থাকলে অন্তত অনাহারের ভয় থাকবেনা, সেটাও হলো জমি ধরে রাখার বড় একটা আকর্ষণ। চতুর্থতঃ, জমি বেচে একসাথে অনেক টাকা হাতে পেলে তা নানা ভাবে খরচ হয়ে যাবে এ হলো আরেক সমস্যা (চুরি হয়ে যাবে, সবাই ধার চাইবে, ছেলে মোটরবাইক কিনে বসবে, এই সব কথা বার বার শোনা গেল)।

তুলনামূলকভাবে সম্পন্ন (এবং শিক্ষিত) কৃষকেরা বললেন যে অনুর্বর জমি হলে ভালো দাম পেলে বেচে দিতে কোনই আপত্তি নেই তাঁদের। শুধু তাই না এঁরা শিল্পায়নের পক্ষে, কারণ এঁদের কাছে কৃষিতে লাভের হার কমে গেছে। এঁদের কারোর জমি অধিগৃহীত হলেও সেই নিয়ে তাঁদের খুব একটা ক্ষোভ নেই। বরং, তাঁরা কারখানা হলে তার আনুষঙ্গিক যে নানা ব্যবসার সুযোগ তৈরি হত তা হাত থেকে ফসকে যাওয়ায় খুবই বিমর্ষ। কৃষির বাইরের জগত এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগের নানা সুযোগ সম্পর্কে এঁরা বেশ ভালই ওয়াকিবহাল।

এর অর্থ হলো দরিদ্র কৃষকের কাছে জমি শুধু একটি আয়-উত্পাদনকারী সম্পদই নয়, তা হলো একাধারে বীমাপত্র, অবসর ভাতা, সঞ্চয়ের মাধ্যম, ঋণ নেবার জন্যে বন্ধক, এবং এমন একটি সম্পদ যা মুদ্রাস্ফীতি এবং চুরি-ডাকাতির ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত। আমাদের অর্থনীতির আধুনিক এবং আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে এই সব পরিষেবার জন্যে আলাদা আলাদা বাজারি বা সরকারি প্রকল্প আছে কিন্তু তা যেহেতু এঁদের আওতার মধ্যে নেই, তাই জমি একাধারে এতরকম ভূমিকা পালন করছে। তাই থোক টাকা তাঁদের কাছে এমন এক মুদ্রা, যার মূল্য আমার বা আপনার কাছে যা তার থেকে অনেক কম। আমাদের অর্থনীতির ভাবনা চিন্তার জগতে এই সহজ কথাটির অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী তাত্পর্য আছে।

প্রথমত, সাধারণত আমরা ভাবতে পারি যে কোনো জিনিসের দাম বাড়তে থাকলে যাঁরা আগে সেই দামে বিক্রী করতে রাজী হবেন তাঁরা তুলনায় দরিদ্র, কারণ টাকার মূল্য তাঁদের কাছে বেশি। কিন্তু এই ভাবনার পেছনে আছে টাকা হলো এমন এক মুদ্রা যার মূল্য সবার কাছে সমান এই ধারণাটি। পূর্বালোচিত কারণে তা ঠিক নয়, এবং তাই শুধু কত দাম বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না ভেবে কি ভাবে সেটা দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা করা দরকার। এই মুহূর্তে আলোচিত হচ্ছে থোক টাকা বাদ দিয়ে বার্ষিক বৃত্তির (annuity) কথা সেটা সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু সেখানেও মুল্যবৃধিধর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা থাকা দরকার, এবং শিল্পে বা ব্যবসায় যে বিনিয়োগ হবে তার লাভের একটা অংশ কিভাবে কৃষক পেতে পারেন তা নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন। [৯] সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগৃহীত জমির একটা অংশে দোকান খোলার জন্যে ছোট এক টুকরো জমি দেবার প্রকল্প চালু করেছেন, সেটাও এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। শুধু তাই না, কৃষক তাঁর শ্রম অন্য কোনো পেশায় কিভাবে নিয়োগ করবেন তা নিয়েও প্রশিক্ষনমূলক প্রকল্পের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, যে অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরণের বাজার (যেমন ঋণের, বিমার, নানা ধরণের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের) অনুপস্থিত, অসম্পূর্ণ, অথবা ত্রুটিযুক্ত সেখানে জমির বাজারে চাহিদা এবং যোগানের সরল তত্ব প্রয়োগ করতে গেলে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। যেমন, কোনো এলাকায় বাস্তবে কত জমি আছে, জমির বাজার দাম কত, এবং শিল্প ও কৃষিতে বিনিয়োগে লাভের আপেক্ষিক হার কত এই সব তথ্য থেকে সেখানে শিল্পের জন্যে জমি দরকার হলে কত দামে জমি পাওয়া যাবে তা অনুমান করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা। পূর্বোক্ত কারণে সেখানে জমির আসল দাম তার থেকে অনেক বেশি হবার সম্ভাবনা। আবার, জমির দাম বাড়লে যোগান বাড়ার বদলে কমে যেতে পারে কারণ ঋণের বন্ধক হিসেবে জমির মূল্য কৃষকের কাছে বেড়ে যাবে তাতে তার জমি ধরে রাখার আকর্ষণ বেড়ে যাবে। এখন কৃষকের কাছে ঋণ-এর বাজার সুগম হলে তার কাছে বন্ধক দেবার মতো সম্পদ হিসেবে জমির ওপর নির্ভরতা খানিকটা কমবে। তাই জমির যোগানকে শুধু জমির বাজারের সমস্যা দেখলে হবেনা, এর সাথে জড়িয়ে আছে ঋণ, বিমা এবং আরো অন্যান্য নানা বাজারের সমস্যাও। সেগুলো লাঘব হলে জমির যোগান বাড়বে।

তৃতীয়ত, জমির মোট যোগান নয়, শিল্পের জন্যে জমির লভ্যতা নির্ভর করবে জমির বন্টনেরও ওপর। যেখানে জমি বহু-বিভাজিত এবং অনেক ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র কৃষক আছেন সেখানে জমির লভ্যতা কম হবে। সিঙ্গুরে যে ৯৯৭ একর জমি অধিগৃহীত হয় তাতে ক্ষতিপূরণের দাবীদার ছিলেন চোদ্দ হাজারেরও বেশি কৃষক যা থেকে পরিষ্কার ব্যক্তি-পিছু মালিকানা কত অল্প। জমি-বিভাজনের সমস্যাটি সবজায়গাতেই আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ভূমি-সংস্কারের সাফল্য শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার পথ আরো বন্ধুর করেছে। একেই বলে বাম বিধির বিধি বাম! শুধু তাই না, জমির বহু-বিভাজনের আরেকটা ফল হলো যে কোনো শিল্প-প্রকল্পের জন্যে এক সাথে বহুজনের সাথে দরাদরি করতে হয়, যাতে অনেকে রাজি থাকলেও অল্পসংখ্যক কিছু বিক্রেতা চড়া দাম চেয়ে প্রকল্পটি আটকে দিতে পারেন। আবার এই মুদ্রার উল্টোপিঠ হলো, শিল্পের সম্ভাবনায় জমির দাম বাড়তে থাকলে জমির মাফিয়া সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ওপর জোর-জবরদস্তি করে তাদের জমি বিক্রী করতে বাধ্য করতে পারে (এই প্রসঙ্গে রাজারহাটের বেদান্ত-কাণ্ড উল্লেখযোগ্য)। এই সব কারণে সরকারের হাজার সমস্যা থাকলেও এই বিষয়ে খোলাবাজারের ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায়না। যতই হোক, গুজরাতে ন্যানো-প্রকল্পে গুজরাত শিল্প বিকাশ সংস্থার (GIDC) ভূমিকা ছিল খুবই সক্রিয়। তবে গুজরাতে তুলনায় জমি বিভাজনের সমস্যাটা কম। গুজরাটের জমি অধিগ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে খবরের কাগজে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি

প্রবন্ধে এক কৃষকের কথা আছে, যাঁর নাম কালুভাই ভাঙ্কার। [১০] দলিত সম্প্রদায়ের এই কৃষকের পনের বিঘা (অর্থাত ৫ একর) জমি ছিল। লক্ষণীয় যে, সিঙ্গুরের কৃষকদের তুলনায় এই গুজরাটি কৃষকের জমির পরিমান অনেকগুণ বেশি। ন্যানো কারখানার সুবাদে বিঘাপ্রতি ২৮.৫ লাখ টাকা দরে টা বেচে দিয়ে, তিনি আজ ৪.৩ কোটি টাকার মালিক। মাত্র দু বছর আগে ওই অঞ্চলে জমির দাম ছিল বিঘা-প্রতি ২ থেকে ৩ লাখ টাকা। টাটা-দের আসার খবরে দাম বেড়ে দাঁড়ায় বিঘা-প্রতি ১০ লাখ, আর গুজরাট শিল্প বিকাশ সংস্থা দাম বাড়িয়ে উপরোক্ত অঙ্কটি প্রস্তাব করে। এই কৃষকটি এই টাকা দিয়ে রাজ্যের অন্যত্র কৃষিজমি কিনছেন। শিল্পের জন্যে কৃষি জমি হস্তান্তরের অভিজ্ঞতা যে সব সময় বিয়োগান্ত হয়না এ তার একটা উদাহরণ।

চতুর্থতঃ, সিঙ্গুরের অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে দারিদ্রের দুষ্টচক্রের (vicious circle) একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বেরিয়ে আসে। অনেক ক্ষুদ্র কৃষক থাকায়, এবং কৃষির বাইরে জীবিকার সুযোগ সীমিত হওয়ায়, তাদের জমির ওপর নির্ভরতা চরম এবং তাই শিল্পের জন্যে জমির লভ্যতা কম। সেই কারণে শিল্পের বিকাশ কম, আবার সেই কারণে কৃষির বাইরে জীবিকার সুযোগ সীমিত। তবে যেকোনো দুষ্টচক্রের আবর্তেই লুকিয়ে থাকে এক শিষ্টচক্রের (virtuous circle) সম্ভাবনা। শিল্পের বিকাশ হলে এবং তাতে কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা হলে জমি বিক্রী করার ব্যাপারে ক্ষুদ্র কৃষকদের যে অনীহা তা দূর হতে পারে। শুধু তাইনা, গুজরাতের এই অঞ্চলে এই ঘটনার ফলস্বরূপ এখন নতুন নতুন ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে কৃষকদের এই সদ্য-লব্ধ অর্থের বিনিয়োগের আশায়। এর ফলে কৃষিকাজ বাদ দিয়ে অন্যান্য নানা কারণে কৃষকের জমি-র ওপর যে অতিরিক্ত নির্ভরতার কথা বারবার উল্লেখ করেছি, সেটাও কমার কথা।

৪. অর্থময় অর্থনীতি

শুরু করেছিলাম এই চিন্তাটা দিয়ে যে বাজারব্যবস্থায় বিনিময় নিয়ে অর্থনীতির কিছু অন্তর্নিহিত স্বতঃসিদ্ধ আছে যা আমাদের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে, যে অনেক সময় আমরা সচেতন থাকিনা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ফলে যে নীতি গ্রহণ করা হয় তা বিনিময়ের এবং শেষ বিচারে অর্থনৈতিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে এই বিষয়টির কিছু কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। এর অর্থ মূলধারার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে নাকচ করা নয়, তাকে আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা। শিল্পায়ন আদৌ কাম্য কিনা, উন্নয়নের বিকল্প কোনো দিশা আছে কিনা, এই সব বিতর্কে ঢুকিনি। সাহস অর্জন করতে পারলে ভবিষ্যতে কখনো তা নিয়ে লেখার ইচ্ছে রইলো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বর্ধন, কৌশিক বসু, (প্রয়াত) মৈত্রেয় ঘটক, পরীক্ষিত ঘোষ, সুগত মার্জিত, দেবরাজ রায়, অভিরুপ সরকার, এবং সিঙ্গুর এলাকার বহু কৃষকের সাথে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। এই প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়গুলির নানা দিক নিয়ে যৌথ গবেষণার সূত্রে টিমোথি বেসলি, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ মিত্র, এবং সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বহু আলোচনা হয়েছে, তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। লেখার

সময় পরামর্শ দিয়ে নিরন্তর মুশকিল আসান করেছেন মনীষিতা দাশ। সম্পাদক অনিল আচার্য্যের তাড়া না থাকলে লেখাটি হতনা, তাই তিনিও পাপের ভাগীদার। পাঠকের মতামত জানাবার ঠিকানা maitreesh@gmail.com।

টিকা ১: অর্থনীতির এই মাপকাঠি গুলি নিয়ে এই পত্রিকার গত বছরের পুজোসংখ্যায় "দেহ মনের সুদুর পারে: বাজারের সীমা" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

টিকা ২: তার মধ্যে সঙ্গদোষে পড়ে আমিও আছি - এই প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য : Abhijit Vinayak Banerjee, Pranab Bardhan, Kaushik Basu, Mrinal Datta Chaudhury, Maitreesh Ghatak, Ashok Sanjay Guha, Mukul Majumdar, Dilip Mookherjee, Debraj Ray: "Beyond Nandigram: Industrialiasation in West Bengal" Economic and Political Weekly of India, April 28, 2007। এই প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদটি দুই কিস্তিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরয় এপ্রিল ২৫ এবং ২৬, ২০০৭ এ। আরো সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা প্রণব বর্ধনের এই প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে "To Not Land In Trouble " (Hindustan Times, September 23, 2010)।

টিকা ৩: Amartya Sen, Idea of Justice, Cambridge : Harvard University Press, 2009 .

টিকা ৪ : এখানে বলে রাখা ভালো যে এখানে সাম্যপন্থী বলে যাঁদের ধরা হচ্ছে তার মধ্যে শুধু তথাকথিত বামপন্থী নয় আরো অনেকেই আছেন যাঁরা যে কোনো বন্টন ব্যবস্থায় সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষের কি হবে তার ওপরে জোর দিয়েছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ ("পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"), গান্ধী ("Recall the face of the poorest and the weakest whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him."), এবং দার্শনিক জন রলস (John Rawls) যিনি এই ধারনাটিকে তাত্বিক রূপ দিয়েছেন।

টিকা ৫ : এমনকি অর্থনীতির দিক থেকেও তার পরিণাম ভালো হতনা কারণ সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা এই ধরণের মূল্যবোধ বিনিময়ব্যবস্থাকেও জোরদার করে - সব কিছুর জন্যে তো আর আইন-আদালত-পুলিশ ব্যবহার করা যায়না।

টিকা ৬: একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করে বোঝাতে চেষ্টা করি। ধরুন আপনি এমন একটা কোম্পানি তে চাকরি পেলেন যার জন্যে অনেক মেহনত করে আপনাকে বিশেষ কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম শিখতে হলো যা এই কোম্পানি-র বাইরে আর কোথাও ব্যবহার হয়না। এবার এই কোম্পানি যদি উঠে যায়, তাহলে আপনার এই বিনিয়োগ-টি জলে যাবে। তাই এই চাকরি নেবার সময় এই চিন্তাটা আপনার মাথায় থাকবে। এই জন্যে, এরকম পরিস্থিতি হলে আপনার যদি কোনো রকম ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি না থাকে তাহলে আপনি এই চাকরিটা নিতে চাইবেননা। কিন্তু যদি সর্বত্র প্রচলিত কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম শেখার জন্যে আপনি সময় ব্যয় করেন, তাহলে কোনো অসুবিধে নেই।

টিকা ৭ : তার মানে এই নয় যে সম্পর্ক-ভিত্তিক বিনিয়োগ না থাকলে, কাউকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেবার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নেই। এক কাজ থেকে আরেক কাজে নিয়োগ হবার পথ সুগম করার জন্যে সরকারি নানা প্রকল্প এখানে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন বেকার ভাতা, কর্মনিয়োগের প্রতিশ্রুতি (employment guarantee)। আবার সরকারি আইন অনুযায়ী যদি কারোর কোনো সম্পদের ওপর ব্যবহার-অধিকার থাকে তাহলে সেই সম্পদ বিক্রী হলে তাদের অনুমতি আদায় করার জন্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে থাকে, পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষীদের ক্ষেত্রে যা এখন আইনত স্বীকৃত। আবার যদি কেউ ভাবেন আধুনিক অর্থনীতি গুলিতে এই ধরণের অধিকারের স্বীকৃতি

নেই - এই সব প্রসঙ্গ পিছিয়ে থাকা অর্থনীতিগুলোতেই খালি ওঠে - তাহলে ভুল হবে, কারণ বড় কোম্পানির ম্যানেজারদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করলে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় যাকে "সোনালী প্যারাশুট" বলা হয়।

টিকা ৮ : এই যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে লেখা একটি যৌথ-প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি: "No Way Out of this Plot", Financial Express September 30, 2009.

টিকা ৯ : এই নিয়ে টিকা ২ এ উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

টিকা ১০ : এই তথ্য গুলি Nisha Nambiar এবং Syed Khalique Ahmed লিখিত “Rewriting the Land Acqusition Story” (Financial Express, September 20, 2010) নামক প্রবন্ধটি থেকে সংকলিত।